একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভবিষ্যতঃ কৃষির প্রতি তরুণদের নতুন করে আকৃষ্ট করা

তরুণদের মানুষ সাধারণত যৌবনেই নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্ড়া করা শুর“ করে, কোন পথে এগোনো উচিত সেটি নির্দিষ্ট করে এবং সে অনুযায়ী তার জীবনের গতিপথ নির্ধারণ করে। বেশিরভাগ গ্রামেই, কৃষক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা সাধারণত এই ধরনের ভবিষ্যত চিন্ড়ার অংশ হয় না। কৃষি একটি নিম্নমানের কাজ এবং খুব বেশি আয় রোজগার করা যায় না, তাই শহরে বা বিদেশে গিয়ে আরো নিত্যনতুন সুযোগ গ্রহণ করাই শ্রেয়। এই অবস্থায়, তরুণকৃষক ছাড়া কৃষি ও খাদ্য ব্যবস্থার ভবিষ্যত কী হবে? কৃষক নেই তো খাদ্য নেই। খাদ্য নেই তো জীবন নেই।

এই প্রকাশনায় আমরা কেন তরুণরা কৃষির প্রতি আকৃষ্ট নয়, তাদেরকে কৃষিকাজের প্রতি মনোযোগী করতে কী কী পদক্ষেপ নেয়া উচিত এবং তরুণদের কৃষিকাজে যুক্ত রাখতে কী কী সুপারিশ করা যেতে পারে সেসব বিষয়ে আলোচনা করবো। এ প্রকাশনার আলোচনা মূলত ৯টি দেশের ৬৬০ জন গ্রামীণ যুবককে নিয়ে এ.এফ.এ সদস্যদের চালানো গবেষণার ফলাফলের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ। "কৃষির প্রতি তরুণদেরআকৃষ্ট করা" বিষয়ের ওপর চালানো গবেষণাগুলো মূলত এগ্রিটেরা নির্মিত ফার্মার্স অ্যাডভোকেসি কনসালটেশন অ্যাক্ট (ফ্যাক্ট) ব্যবহার করে চালানো হয়েছিল। এই প্রকাশনার আলোচনা আরো যেসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে ঠিক করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে- (১) ২০১৪ সালের মে মাসে ১৩টি দেশের ১৭টি কৃষক সংগঠনের ৩০ জন পুরুষ এবং ১০ জন নারী প্রতিনিধিদের নিয়ে আয়োজিত আঞ্চলিক আলোচনার ফলাফল; এবং দাপ্তরিক গবেষণা ও সাহিত্য পর্যালোচনা। আন্ড়র্জাতিক পরিবার কৃষি বর্ষ (ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ ফ্যামিলি ফার্মিং-আই.আই.এফ.এফ) চলাকালীন সময়ে এ.এফ.এ এসব আলোচনা সভা বা সেমিনার আয়োজন করে। কেননা, কৃষিতে তরুণদেরঅবদান আই.আই.এফ.এফ-এর অন্যতম প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

তরুণকারা?

জাতিসংঘের হিসেবে যাদের বয়স ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে, সেই বর্তমান তরুণপ্রজন্ম পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ববৃহৎ তরুণপ্রজন্ম। ২০১২ সাল পর্যন্ড় বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৮ ভাগ অর্থাৎ ১৮০ কোটি জনসংখ্যা ছিল তর“ণ। এসব তর“ণের ৯০ শতাংশই উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বসবাস করে এবং তারা তাদের নিজ নিজ দেশের শতকরা ২০ ভাগ জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করে।

২০১২ সালের ইউএস ই.এসসি.এ.পি'র তথ্য অনুযায়ী, পৃথিবীর মোট তরুণজনসংখ্যার ৬০ ভাগেরও বেশি বসবাস করে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে। ২০১০ সালে ২৩ কোটি ৪০ লাখ তরুণনিয়ে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ তরুণজনসংখ্যার দেশের স্বীকৃতি লাভ করে ভারত। এটি ছিল দেশটির সেসময়কার মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৯ ভাগ। ২২ কোটি ৫০ লাখ তরুণনিয়ে মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৭ ভাগ নিয়ে চীন ছিল দ্বিতীয় অবস্থানে। বাংলাদেশ ও ফিলিপাইনের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগই ছিল তরুণ । সেসময় জাপানে এক কোটি ২০ লাখ বা মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশ ছিল তরুণ জনগোষ্ঠী।

অনেক দেশই যার যার সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে তরুণদেরনিজস্ব পদ্ধতিতে সংজ্ঞায়িত করে। তাইওয়ানে তরুণবলতে ১২ থেকে ২৪ বছর বয়সী নারী ও পুর“ষকে বোঝায়। কিরঘিজস্ড়ানে এ বয়সসীমা ১৪ থেকে ২৮ বছর, থাইল্যান্ডে ১৫-২৫ বছর, ফিলিপাইন, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামে ১৫ বা ১৬ থেকে ৩০ বছর, মঙ্গোলিয়াতে ১৫ থেকে ৩৪ বছর, নেপাল ও মিয়ানমারে ১৫ থেকে ৪০ বছর, বাংলাদেশে ১৮ থেকে ৩৫ বছর, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৯ থেকে ২৪ বছর এবং জাপানে জন্ম থেকে ৩০ বছর বয়সীদের তরুণহিসেবে গণ্য করা হয়।

গ্রামীণ জনপদে তর“ণঃ

আফ্রিকা ও এশিয়ার মোট তরুণজনসংখ্যার ৭০ শতাংশ বসবাস করে গ্রামাঞ্চলে এবং তাদের অর্ধেকেরও বেশি যুক্ত আছেন কৃষিকাজে। বহু দশক ধরেই গ্রামীণ জনপদের তরুণরা উন্নত জনগোষ্ঠী, সরকার ও আন্ড়র্জাতিক নানা প্রতিষ্ঠানের কাছে উপেক্ষিত থাকায় কৃষি ক্ষেত্রে তাদের পূর্ণ শ্রম এবং সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনে তারা ব্যর্থ হয়েছে। গ্রামীণ তরুণরা বেশিরভাগ সময়েই হয় বেকার থাকে অথবা অনিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে স্বল্প বেতনে বা বিনা বেতনে নিযুক্ত থাকে। গ্রামাঞ্চলে পর্যাপ্ত কাজের সুযোগ কম থাকায় তরুণরা শহরে চলে যায়। নানা কারণেই দেখা যায়, কৃষকদের সন্ড়ানরা কৃষিকাজে যুক্ত হতে অনীহা প্রকাশ করে। যারা কৃষিকাজে যুক্ত থাকে, তাদের বেশিরভাগকেই হয় জোর করে সেখানে যুক্ত করা হয়েছে, অথবা অপেক্ষাকৃত ভালো কোন সুযোগ না পাওয়ায় তারা সেখানে থেকে গেছে। এর ফলে নতুন এক সমস্যা দেখা দিয়েছে, আর তা হলো কৃষিকাজে সক্ষম মানুষের বয়স বেড়ে যাওয়া। তরুণরাই যদি জাতির ভবিষ্যত হয়, তাহলে গ্রামীণ তরুণরা হলো কৃষির ও গ্রামীণ শিল্পের ভবিষ্যত। এ অবস্থায় আমরা কীভাবে গ্রামে থেকে কৃষি ও অন্যান্য গ্রামীণ শিল্পের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য তরুণদেরউদ্বুদ্ধ করতে পারি? কী ধরনের পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তাদেরকে এ বিষয়ে আশ্বস্ড় করা সম্ভব যে কৃষি ও গ্রামীণ শিল্পে যুক্ত থাকলে তাদের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যত অপেক্ষা করছে?

কৃষি কেন তরুণদেরকাছে আকর্ষণীয় নয়?

জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে এ.এফ.এ আয়োজিত নানা সেমিনার ও আলোচনা সভা এবং সাহিত্য পর্যালোচনা করে আমরা নিম্নলিখিত সাতটি আন্তঃসম্পর্কীয় কারণকে চিহ্নিত করেছি যার জন্য তরুণরা এমনকি কৃষকের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও কৃষিকাজে যুক্ত হতে আগ্রহ প্রকাশ করবে নাঃ

(১) কৃষকদের নিম্ন আত্মপরিচয়ঃ সাধারণত কৃষিকে কম মেধার প্রয়োজন হয় এমন একটি নিচু মানের নোংরা কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়। কৃষিকাজে সংশ্লিষ্টদের আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ কম থাকে। এই নিচু মানসিকতা বা চিন্তাভাবনা সমাজে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। কৃষকরা তাদের সন্তানদের বলেন- "আমার মতো নিচু মর্যাদার কৃষক হয়ো না", "যদি ভালোভাবে পড়াশোনা না করো, তোমাকেও আমার মতো এ কাজই করতে হবে", "তুমি কোন মেধাবী শিক্ষার্থী না, তাই মাঠে গিয়ে আলুর চাষ করো"। ছাত্রজীবনে অনেক শিশুই বড় হয়ে চিকিৎসক, প্রকৌশলী অথবা আইনজীবী হওয়ার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু কৃষক হওয়ার স্বপ্ন কেউ দেখে না বললেই চলে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কৃষিজাত পণ্য প্রস্তুতকারক এবং কৃষকদেরকে সবসময়ই নিচু শ্রেণীর, অশিক্ষিত, অসভ্য মানুষ হিসেবে গণ্য করা হয়।

(২) কৃষি কোন লাভজনক পেশা নয়ঃ বেশিরভাগ কৃষকই দরিদ্র। তারা কৃষি থেকে প্রয়োজনীয় আয় করতে পারে না এবং যার ফলে পরিবারের বা ব্যক্তিগত সব চাহিদাও পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। বীজ, সার, কীটনাশকসহ কৃষিকাজের জন্য অতি প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিসের দাম বৃদ্ধির কারণে কৃষি থেকে আয় কমে যাওয়া, উৎপন্ন কৃষিপণ্যে বাজারমূল্য কম হওয়া ও তা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে না থাকা, আবহাওয়ার উপর অতিমাত্রায় কৃষির নির্ভরশীলতা এবং দ্রব্যমূল্যের অস্থিতিশীলতার কারণে তরুণরা কৃষির সাথে সম্পৃক্ত হতে চায় না। পরিবারের ভরণপোষণকেই কৃষিকাজের একমাত্র কার্যকারিতা মনে করার কারণে অধিকাংশ তরুণইকৃষিতে কোন ভবিষ্যত সমৃদ্ধির চিত্র দেখতে পায় না।

(৩) জমির মালিকানার নিরাপত্তাহীনতা ও জমির ক্রমবর্ধমান মূল্যঃ ১৯৯০ সালের পর থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভূমি সংস্কারের ফলে কৃষিকাজের পরিধিকে ছোট থেকে বৃহৎ মাত্রায় নিয়ে গেছে এবং এটি ছিল মূলত বাজারমুখী ভূমি সংস্কার। এছাড়া, নগরায়নের স্বার্থে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যক্তি মালিকানার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় জমি এমন এক পণ্যে পরিণত হয়েছে যেটিকে যেকোন সময় বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করা যায়। বাজারমুখী ভূমি সংস্কারের কারণে জমির দাম বৃদ্ধি পায়। কৃষি সংস্কৃতি ও কৃষকরা শাসক শ্রেণীর তৈরি করা কাঠামোর বাইরে নয়। জমি ব্যাংকিং বা জমি সঞ্চয়ের ফলে জমির জন্য আলাদা বাজার তৈরি হয় এবং তা জমি থেকে কৃষকদের উচ্ছেদ করে। এটি মূলত ভূমি নিয়ন্ত্রণের একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে যার মাধ্যমে কে জমি কিনতে বা বেচতে পারবে এবং লাভ করতে পারবে তা সহজেই নির্ধারণ করা যায়। একদিকে, যারা কৃষি জমি চাষ করে তারা এর মালিকানা থেকে বঞ্চিত, অন্যদিকে যারা জমির মালিক, তারা তা চাষ করতে জানে না। কৃষকদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে তা ব্যক্তিগত মালিকানা, বিশেষ করে ভূমি ব্যবসায়ীদের অধীন করার মাধ্যমে কৃষির প্রতি তরুণদেরঅনীহাকে উৎসাহিত করা হয়।

(৪) দুর্বল গ্রামীণ অবকাঠামোঃ কৃষির মূল ভিত্তি হলো গ্রামীণ জনপদ। তবে, তরুণদেরগ্রামে থেকে কৃষির প্রতি আকৃষ্ট করতে সেসব অঞ্চলে পর্যাপ্ত অবকাঠামোর অভাব রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বেশিরভাগ গ্রামেই সড়ক যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, হাসপাতাল, বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, বিনোদন কেন্দ্র, ইন্টারনেট সংযোগ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কৃষি পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের বাজার অথবা কৃষিভিত্তিক ছোট বা মাঝারি আকৃতির প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মতো সুযোগ সুবিধার যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

(৫) কৃষি পরিবারের জন্য সহায়ক সরকারি পরিকল্পনার অভাবঃ উন্নয়নশীল অনেক দেশেই সরকারসমূহ পারিবারিক কৃষি ব্যবস্থার চেয়ে কর্পোরেট বা বাণিজ্যিক কৃষি ব্যবস্থার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়। এর ফলে, এসব দেশে গৃহীত কৃষিনীতি ও প্রকল্পসমূহ কৃষি পরিবারগুলোর জন্য সহায়ক হয় না, যদিও পারিবারিকভাবে কৃষির সাথে সংশ্লিষ্টরাই এশিয়ার মোট কৃষক সম্প্রদায়ের বৃহত্তর অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। এ ধরনের নীতি গ্রহণের ফলে অনেক কৃষকই জমির স্বল্পতা অথবা বিনিয়োগ বা যথাযথ বাজারের অভাব অনুভব করে। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পদ্ধতি এবং বাণিজ্যিক বস্যাংকগুলো মূলত বাণিজ্যিক কৃষি ব্যবস্থাকেই সহায়তা করে। এর ফলে পারিবারিক কৃষি ব্যবস্থা ও কৃষি অর্থনীতি ধ্বংসের মাধ্যমে বাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষিপণ্যের মূল্য কৃষক অথবা রাষ্ট্র নয়, বাজার ব্যবস্থা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। এসব পণ্যের মূল্য নির্ধারণ, বাণিজ্য চুক্তি এবং নীতি নির্ধারণের পদ্ধতিতে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কৃষকদের কোন প্রতিনিধিত্ব থাকে না, ফলে তারা কৃষিখাত বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণের সময় কোন ভূমিকা রাখতে পারে না। এছাড়াও, গ্রামাঞ্চলের তরুণদেরচাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় নীতি ও প্রকল্পের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বেশিরভাগ এলাকাতেই তরুণদেরজন্য নির্দিষ্ট কোন

পদক্ষেপ বা প্রকল্প নেই, থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল। এসব প্রয়োজনীয় সহায়তা না পাওয়ায় তরুণকৃষকদের ধারণা হয় যে, তারা বাণিজ্যিক কৃষকদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে না।

(৬) ভূমি ও কৃষি ব্যবস্থার সংস্কারের অভাবঃ অনেক উন্নয়নশীল দেশেই কৃষি হলো কর্মসংস্থানের অন্যতম বড় খাত। তবে, এসব দেশের বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কৃষি বা ভূমি বিষয়ে পড়াশোনা করানো হয় না, ফলে কৃষি ও ভূমি সংস্কারের প্রতি এক ধরনের অনীহা তৈরি হয়। এসব কারণ কৃষিকে পেশা হিসেবে নেয়ার ক্ষেত্রে তরুণরা নিরুৎসাহিত হয়।

(৭) তরুণকৃষকদের সংগঠনের অভাবঃ স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তরুণকৃষকদের সংগঠনের বড়ই অভাব রয়েছে। এর ফলে, তরুণকৃষকদের নানা সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়া, তথ্যের আদান-প্রদান বৃদ্ধি, পরস্পরের প্রচেষ্টাকে সফল করতে সহায়তা করা এবং নীতিনির্ধারণী জায়গাগুলোতে তাদের বক্তব্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে তরুণকৃষকদের সমস্যায় পড়তে হয়।

তরুণকৃষকরা যেসব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েঃ

কৃষিকাজে যুক্ত তরুণরা নানা ধরনের সমস্যা বা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। এগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ

(১) উৎপাদনশীল বস্তু যেমন ভূমি, অর্থ বা বাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারাঃ প্রথমত, এশিয়ার অনেক দেশেই তরুণকৃষকদের কথা বিবেচনায় রেখে কোন ধরনের ভূমি বা কৃষি ব্যবস্থার সংস্কার করা হয়না। এর ফলে, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কৃষি সংস্কৃতির বাণিজ্যিকীকরণের ক্ষেত্রে তারা কোন অধিকার ভোগ করে না। ভূমিহীন এসব তরুণবেশিরভাগ সময়ই মৌসুমী কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। দ্বিতীয়ত, অনেক তরুণকৃষককেই তাদের পূর্বসূরিদের কাছ থেকে জমির মালিকানা পাওয়ার জন্য বহু বছর পর্যন্ড় অপেক্ষা করতে হয়। যখন তারা তাদের অভিভাবকদের অধীনে কৃষিজমিতে কাজ করে, তখন কৃষি সংশিণ্টষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ড় গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের মত প্রকাশের কোন সুযোগ থাকে না। তৃতীয়ত, শুধুমাত্র কৃষিখাতে সহায়তা প্রদান করার মতো কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান নেই। যদি থেকেও থাকে, তাহলেও তরুণকৃষকদের চাহিদা অনুধাবন করার ক্ষেত্রে তাদের দুর্বলতা রয়েছে। চতুর্থত, অনেক তরুণকৃষকই এখনও পর্যন্ড় তাদের নিজস্ব বাজার তৈরি করতে পারেনি।

(২) উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ব্যবসা বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতার অপ্রতুলতাঃ বর্তমান প্রজন্মের তরুণকৃষকদের কৃষি বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা এবং নেতৃত্ব বা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তির হস্ড়ান্ড়রকরণকে আদর্শ তরুণকৃষি ব্যবস্থার মূল হিসেবে মনে করা হয়। তবে, এসব বিষয় সরকার গৃহীত নানা প্রকল্প বা বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। তরুণরাই নতুন নতুন প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহী হলেও অনেক প্রতিষ্ঠানই তাদের এ চাহিদাকে ঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে না। এছাড়া, অনুপ্রেরণার অভাব এবং কৃষি খাতে নতুন আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তার ঘাটতির কারণে অনেক তরুণকৃষকই কৃষিকাজে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কোন সম্ভাবনা দেখতে পায় না।

(৩) বিশ্বায়ন, অনিশ্চয়তা ও দ্রব্যমূল্যের ভারসাম্যহীনতাঃ এশিয়ার কিছু কিছু দেশে কৃষিপণ্যের উপর স্বল্প মাত্রার কর বা উন্মুক্ত ব্যবস্থার ফলে তরুণকৃষকরা তাদের পণ্য নিয়ে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে এবং এক পর্যায়ে কৃষি কাজ পরিত্যাগ করে। কৃষিপণ্যের মূল্যের অস্থিতিশীলতা আরেকটি বড় কারণ। কৃষিপণ্যের উপর স্বল্প মাত্রার কর বা কোন করই না থাকায় বিদেশি পণ্যগুলোকে দেশীয় পণ্যের তুলনায় অনেক সাশ্রয়ী মনে হয়। মানুষ সাধারণত দামী জিনিসের তুলনায় কম দামী পণ্যকেই বেশি প্রাধান্য দেয়। বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তির কারণে ছোট মাপের কৃষকরা লোকসানের মুখে পড়ে এবং কৃষিকাজ ছেড়ে দেয়।

তরুণদেরকৃষির প্রতি আকৃষ্ট করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ

(১) সামর্থ্য বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব গুণের উন্নয়নঃ বিশ্বব্যাপী খাদ্য সঙ্কটের মুখে গত পাঁচ বছর ধরে এ.এফ.এ সদস্যবৃন্দ এবং তাদের সহযোগী যেমন সিএসও, বিভিন্ন দেশের সরকার এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থাসমূহ কৃষক এবং কৃষক সংগঠনসমূহের সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ ঘটানোর জন্য নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসব পদক্ষেপের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে গ্রামীণ জনপদে বসবাসকারী তরুণপ্রজন্ম। কয়েকটি দেশে কৃষকদের সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ ঘটানোর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিশেষ কাঠামো গঠন করা হয়েছে। নিজেদের মধ্যে জ্ঞান ও তথ্যের আদান-প্রদান সহজ করতে কৃষকদের পারস্পরিক মতবিনিময় সভাও আয়োজন করা হয়েছে।

বক্স-১ঃ জাপানের তরুণকৃষক সম্প্রদায়ঃ

২০১৩ সালে জাপানে, ছয়জন তরুণকৃষকের উৎপাদিত পণ্য থেকে পাওয়া লাভের পরিমাণ গড়ে ২০৭% বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাদের এ সাফল্যের মূল কারণগুলো ছিল- দক্ষতা, ভূমি, বাসস্থান এবং বাজার বিষয়ে তাদের কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষকদের কাছ থেকে পাওয়া সহায়তা। এসব নতুন তরুণকৃষক তাদের চেয়ে বয়সে বড় কৃষক, ওই অঞ্চলের অন্যান্য কৃষক, সরকারের নানা

কর্তৃপক্ষ আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা, বই পড়া এবং ইন্টারনেট ঘেঁটে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করেছিল। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার পর তারা নতুন কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেয়। একইসাথে, তিনটি বড় কৃষি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় তারা দিন দিন পরস্পরকে আরো বেশি করে সহযোগিতা করা এবং সংঘবদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তারা মূলত তিনটি উপায়ে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ক্রেতা সংগ্রহ করতো- বয়োজ্যেষ্ঠ কৃষকদের সূত্রে, নিজেরা ক্রেতা অন্বেষণ করে এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করে।

বক্স-২ঃ নতুন কৃষক প্রকল্প, তাইনান সিটি, তাইওয়ানঃ

এই প্রকল্পের অধীনে বর্তমানে ৪৫ বছরের কম বয়সী ২৬৮ জন তরুণকৃষক রয়েছেন যাদের ১৪ শতাংশই নারী। তাদের কেউ কেউ এরই মধ্যে কৃষক হয়ে গেছেন, অথবা কৃষক হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সরকারি এই প্রকল্পের মাধ্যমে তরুণকৃষকদের প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়। প্রযুক্তি সহায়তা দেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ, শিক্ষানবিশি কর্মশালা, কৃষি বিষয়ক কোর্স এবং পরামর্শ প্রদানের মতো মাধ্যমসমূহ ব্যবহার করা হয়। যেসব কৃষক অথবা কৃষি বিশেষজ্ঞ তরুণকৃষকদের কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন, তাদেরকে জেলা কৃষক এসোসিয়েশনের মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয়। আর্থিক সহায়তার অংশ হিসেবে তরুণকৃষকদের কৃষি সম্পর্কিত নানা পণ্য ক্রয়ের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কম সুদে ঋণ দেয়া হয়। এ প্রকল্পের ফলে অসংখ্য তরুণকৃষক সফলতার মুখ দেখে এবং তরুণমিলিয়নেয়ার কৃষকে রূপান্ড়রিত হয়। এছাড়া, নানা কৃষি পণ্য বিষয়ক প্রতিযোগিতাতেও তারা সাফল্য অর্জন করে।

(২) পারিবারিক কৃষি ব্যবস্থা বিষয়ক আলোচনাঃ

কৃষি খাতে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর ক্রমবর্ধমান হস্ড়ক্ষেপ, ভূমি দখল এবং বাণিজ্যিক কৃষি ব্যবস্থার প্রসারের ফলে পরিবারভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা ও কৃষি অর্থনীতি বিষয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। ২০১৪ সালে জাতিসংঘ ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ ফ্যামিলি ফার্মিং উদযাপন করে এবং বেশিরভাগ এফ.ও বা কৃষক সংগঠন, সি.এস.ও এবং সরকারি সংস্থা এর প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। কৃষি ও খাদ্য খাতে কর্মরত এফ.ও বা কৃষক সংগঠন এবং সি.এস.ও সমূহ নানা ধরনের আলোচনা ও সমালোচনার মাধ্যমে পরিবারভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থার জন্য স্থায়ীত্বশীল নীতি নির্ধারণ এবং বাজারে পারিবারিক কৃষকদের অংমদারিত্ব আরো বাড়ানোর চেষ্টা চালায়। পরিবারভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থার উপর গুর"ত্বারোপ তরুণদেরকৃষির প্রতি আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে বিশেষ গুর"ত্ব লাভ করেছে।

(৩) স্থিতিশীল, পরিবেশবান্ধব প্রাকৃতিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলাঃ উন্নত জীবনযাপনের অংশ হিসেবে মানুষ প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রতি বেশি গুর"ত্ব দিচ্ছে। এর ফলে, প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এর ইতিবাচক দিক হলো, প্রাকৃতিক কৃষি খামার প্রতিষ্ঠার দিকে মূলত তরুণরাই বেশি ঝুঁকছে এবং তাদের আগ্রহ দিন দিন বেড়েই চলেছে। প্রাকৃতিক কৃষি তাদের কাছে একটি কার্যকর বিষয় হিসেবে গণ্য হচ্ছে, তারা এর মধ্যে নিত্যনতুন পদ্ধতি আবিস্কারের সুযোগ পাচ্ছে এবং পুরোনো ও নতুন নানা কৃষিকাজ পদ্ধতি সম্পর্কে তারা জানতে পারছে। কয়েকটি দেশের সরকার স্থিতিশীল, পরিবেশবান্ধব প্রাকৃতিক কৃষি ব্যবস্থার প্রতি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, এর ফলে কৃষির প্রতি তরুণদেরআগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার যেসব অভিবাসী মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করতে গিয়েছিলেন, তাদের অনেকেই দেশে ফিরে কৃষির সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন এবং তারা কেউ কেউ প্রাকৃতিক কৃষি খামারও গদে তুলেছেন।

বক্স-১ঃ আনা সিবায়ানঃ

২৪ বছর বয়সী আনা ফিলিপাইনের মিন্দোরো ওরিয়েন্টালের এক কৃষক দম্পতির সন্ড়ান। তিনি বাণিজ্যিক রান্না বিষয়ক কোর্স সম্পন্ন করলেও সবসময়ই কৃষিকাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন এবং সম্পূর্ণ নিজের একটি কৃষি খামার ব্যবসা গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতেন। ফিলিপাইনের জাতীয় কৃষক সংগঠন পাকিসামা (পি.এ.কে.আই.এস.এ.এম.এ)-এর তত্ত্বাবধানে আয়োজিত ইন্টিগ্রেটেড ডাইভারসিফাইড অর্গানিক ফার্মিং সিস্টেমস (আই.ডি.ও.এফ.এস) বা বিশেষায়িত প্রাকৃতিক কৃষি ব্যবস্থা বিষয়ে একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশ নেয় আনা। ২০১৪ সালে এই আই.ডি.ও.এফ.এস প্রশিক্ষণ নেয়ার পর আনা তার পরিবারের ২,৫০০ বর্গমিটার আয়তনের কৃষি খামারকে একটি আই.ডি.ও.এফ.এস কৃষি খামারে রূপান্ড়রের বিষয়ে পরিবারকে রাজি করাতে সক্ষম হয়। সেই জমিতে তিনি এক ধরনের মিশ্র সার তৈরির ব্যবস্থা, একটি মাছ চাষের পুকুর, একটি সব্জি বাগান গড়ে তোলেন এবং মুরগী পালন শুর" করেন। তার পরিবারের কৃষি খামারের প্রতিটি বর্গমিটার অংশের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করেন আনা। বর্তমানে তিনি তার আশপাশের এলাকায় অবস্থিত তরুণকৃষকদেরকে আই.ডি.ও.এফ.এস কৃষি খামার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করছেন। ফিলিপাইনে ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ ফ্যামিলি ফার্মিং উদযাপনের সময় আনাকে একজন আদর্শ কৃষকের পুরস্কার দেয়া হয়।

(৪) এফ.ও বা কৃষক সংগঠন গড়ে তোলাঃ কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সে.এস.ও এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা সহায়তা দিয়ে আসছে। এর মাধ্যমে কৃষকরা কৃষি নীতি নির্ধারণ বা পরিবর্তন এবং কৃষিকাজের উন্নয়নে ভূমিকা রাখার সুযোগ পাচ্ছে। কৃষক সংগঠনগুলো তাদের যুব সংগঠনও গড়ে তোলা শুর করেছে। কৃষকদের অধিকার এবং তাদের জন্য গৃহীত নানা পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করছেন তারা।

বক্স-৪ঃ মঙ্গোলিয়ার যুব সংগঠনসমূহঃ

মঙ্গোলিয়াতে তরুণদেরসম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বেশ কয়েকটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কাজ করে। এর মধ্যে মঙ্গোলিয়ান ইয়ুথ ফেডারেশন (এম.ওয়াই.এফ) সেদেশের সর্ববৃহৎ এন.জি.ও বা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে স্বীকৃত। তরুণদেরজীবন মান উন্নয়ন এবং তাদের অধিকার রক্ষাই এ সংস্থাটির মূল লক্ষ্য। ২০১৩ সালে মঙ্গোলিয়ার তরুণকৃষকদের নিয়ে মঙ্গোলিয়ান ইয়ং হার্ডারস কমিটি গঠন করা হয়, যার মূল লক্ষ্য ছিল তরুণকৃষকদের অধিকার আদায় করা। ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এটি একটি জাতীয় আলোচনা সভা আয়োজন করে যেখানে মঙ্গোলিয়ার ২১টি প্রদেশের তরুণকৃষকরা অংশ নেয়। তরুণকৃষকদের সম্পর্কিত নানা ধরনের বিষয় নিয়ে এই কমিটি জাতীয় পর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া, ২০১০ সালে গঠিত হয় ইয়ং কো-অপারেটর্স ক্লাব। এই সংস্থাটি ২০১৩ সালে কো-অপারেটিভ ইয়ং লিডারশিড ইন অ্যাগ্রিকালচার বিষয়ক প্রথম মিটিং সফলভাবে আয়োজন করে।

বক্স-৫ঃ কম্বোডিয়ার ইয়ুথ কমিটিঃ

কম্বোডিয়াতে, ফার্মার এন্ড নেচার নেট (এফ.এন.এন) নামের একটি সংগঠন তাদের নিজস্ব ইয়ুথ কমিটি বা যুব সংগঠন গড়ে তুলেছে যার প্রতিনিধিত্ব সংস্থাটির সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। সঠিক কৃষি সম্পর্কিত জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমে তরুণকৃষকদেরকে তরুণনেতা এবং কৃষক উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। তাদেরকে মাছ চাষ, প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন, বহুমাত্রিক কৃষি খামার তৈরি, পশু পালন এবং বায়ো-গ্যাস উৎপাদনের বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

(৫) নারী কৃষকদের উৎসাহিত করাঃ যেহেতু গ্রামাঞ্চলের একটি বড় সংখ্যক পুর ষ জনগোষ্ঠী শহরে চলে যায়, তাই কৃষি ব্যবস্থা ধীরে ধীরে নারীকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। এর ফলে, নারী কৃষকদের অধিকার এবং ভূমির উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা শুর হয়েছে। নিজেদের অধিকার বিষয়ে কথা বলার জন্য নারী কৃষকরাও সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসছেন। নেপালসহ কয়েকটি দেশে নারী কৃষকদের আলাদা সংগঠনও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(৬) পরিবারভিত্তিক কৃষকদের জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণের পক্ষে কথা বলাঃ ভারত, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, ফিলিপাইনের মতো দেশগুলোতে কৃষক সংগঠনসমূহ ভূমি ও কৃষি ব্যবস্থার নানা সংস্কার প্রক্রিয়া বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা সভা ও সেমিনার আয়োজন করে আসছে। এসব সংস্কারের মধ্যে রয়েছে ভূমির মালিকানা, কৃষি সম্পর্কিত নানা প্রযুক্তি ও অন্যান্য সুবিধা গ্রহণের সুযোগ, ভূমি ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণ এবং ভূমির ব্যবহার ও কৃষকদের অধিকার বিষয়ক নীতি গ্রহণ ও তার বাস্ড়বায়ন করা। এসব কর্মকা ের সাথে এফ.ও বা কৃষক সংগঠন এবং সি.এস.ও সমূহ সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছে। তরুণকৃষকদের জন্য সুবিধাজনক হয় এমনভাবে ভূমি ও কৃষি ব্যবস্থার সংস্কার করার জন্য কৃষকরা নিজেদেরকে সংগঠিত করছেন। বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, নেপাল, মঙ্গোলিয়া, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনের মতো দেশগুলোতে এফ.ও বা কৃষক সংগঠন, সি.এস.ও এবং জাতিসংঘের সংস্থাগুলো তরুণকৃষকদের জন্য সুবিধাজনক নানা নীতি গ্রহণের পক্ষে গবেষণা এবং নানা ধরনের কেস স্টাডি পরিচালনা করছে। এসব গবেষণা এবং কেস স্টাডিকে তারা সরকার এবং নীতি নির্ধারকদের পরিকল্পনাকে প্রভাবিত করার কাজে ব্যবহার করছে। আই.এন.জি.ও বা আন্ড়র্জাতিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এবং দ্বিপাক্ষিক সংগঠনসমূহ ক্রমশই তরুণকৃষকদের সহায়তা করা এবং কৃষি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

বক্স-৬ঃ কোরিয়ার তরুণকৃষকরা

কোরিয়ান অ্যাডভান্সড ফার্মারস ফেডারেশন (কে.এ.এফ.এফ) এবং উইমেন অ্যাডভান্সড ফার্মারস ফেডারেশন (ডবি- উ.এ.এফ.এফ)-এর মতে, হাজারো সমস্যা থাকলেও কৃষি ক্ষেত্রে এখনও বিশাল সম্ভাবনার দিক রয়েছে। কর্পোরেট কোম্পানিগুলো ক্রমান্বয়ে কৃষিজমি অধিগ্রহণের যে সমস্যা রয়েছে, তার সমাধানের লক্ষ্যে সরকার এমনভাবে ভূমির মালিকানার নিয়মকানুন নির্ধারণ করেছে, যে যারা কমপক্ষে পাঁচ বছর ধরে কৃষিকাজ করছে শুধুমাত্র তারাই গ্রামাঞ্চলে জমির মালিক হওয়ার অধিকার রাখবে। এফ.টি.এ'র কারণে ক্ষতিগ্রস্ড় কৃষকদের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে সরকার এমন একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যার মাধ্যমে এফ.টি.এ থেকে সুবিধা পাওয়া শিল্পগুলো যেন একটি নির্দিষ্ট তহবিলের মাধ্যমে তাদের লভ্যাংশ কৃষিতে সহায়তা প্রদান করে। সম্প্রতি, কোরিয়ার ধান উৎপাদনকারী কৃষকরা সরকারকে এ বিষয়ে রাজি করাতে সক্ষম হয়েছে যে এফ.টি.এ'র কারণে তাদের যে লোকসান হয় তার জন্য তারা যেন সরকারের কাছ থেকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ পায়। কোরিয়ার কৃষকরা যেন বেঁচে থাকতে পারে তা নিশ্চিত করা সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হিসেবে দেখা হচ্ছে। কে.এ.এফ.এফ একটি নীতিমালা প্রস্ড়াব করেছে যা- (১) পর্যাপ্ত অর্থ, প্রযুক্তিগত সহায়তা ও শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে পরিবারভিত্তিক কৃষি

ব্যবস্থা বেঁচে থাকা নিশ্চিত করবে, (২) সেনাবাহিনী থেকে তরুণকৃষকদের অব্যাহতি দেবে, (৩) সুদের হার বর্তমানের শতকরা তিন ভাগ থেকে এক ভাগে নামিয়ে আনার মাধ্যমে তরুণকৃষকদের অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করবে, (৪) তরুণকৃষকদের সংগঠনের প্রতিনিধিদের কে.এ.এফ.এফ-এর কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করবে, এবং (৫) তরুণকৃষকদের সামাজিক দায়বদ্ধতা বোধ বৃদ্ধি করবে ও তাদেরকে স্থানীয় কৃষকদের নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

তরুণদেরকৃষির প্রতি আকৃষ্ট করা এবং কৃষিতে সংযুক্ত থাকতে উৎসাহিত করার জন্য সরকারগুলো কী কী পদক্ষেপ নিতে পারে?

গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী তরুণদেরসাথে কথা বলে এবং আলোচনা করে আমরা যা বুঝতে পেরেছি তা হলো, তরুণরা কৃষিকাজে সম্পৃক্ত হবে যদি- (১) কৃষি থেকে তারা পরিবার পরিচালনার মতো পর্যাপ্ত অর্থ আয় করতে পারে, (২) তাদেরকে জমি, পুঁজি, প্রশিক্ষণ, খামার পরিচালনার যন্ত্রপাতি এবং পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের বাজারের মতো গুর"ত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সরবরাহ করা হয়, (৩) তারা যদি কৃষিকাজের কোন কার্যকর অর্থ ও গুর"ত্বটি বুঝতে পারে।

এসব প্রস্ড়াবনা বা সুপারিশ গ্রহণ করা হলে, তরুণকৃষকরা তাদের নিজ নিজ দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তুলতে পারবে এবং একইসাথে স্থিতিশীল উন্নয়নে গুর"ত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে। উপরোক্ত পদক্ষেপগুলোর সফল বাস্ড়বায়নের মাধ্যমে নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো করা যেতে পারে-

১. তরুণকৃষকদের অন্ড়ত ২৫ বছরের জন্য জমির মালিকানা, ব্যবহারের অধিকার অথবা সরকারের পক্ষ থেকে লিজ নেয়ার অধিকার দেয়া হোক। জমির মালিকানার দীর্ঘকালীন নিশ্চয়তা না পেলে তরুণরা তাদের গ্রামে কৃষিকাজে যুক্ত হতে আগ্রহী হবে না।

২. তরুণকৃষকদের জন্য বিশেষায়িত কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং নানা সহযোগিতামূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হোক। এর মধ্যে কৃষি বিষয়ক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ঋণ সুবিধা, প্রযুক্তিগত সহায়তা, কৃষি বিষয়ক যথাযথ যন্ত্রপাতি প্রদান, ভর্তুকি ও ইন্স্যুরেন্স প্রদান এবং পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের বাজার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে কৃষিকে একটি পেশা হিসেবে নেয়ার জন্য উৎসাহিত করা উচিত। তরুণকৃষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার মাধ্যমে তরুণউদ্যোক্ত হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে। স্থিতিশীল পরিবেশবান্ধব কৃষি পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে তাদের জন্য বহুমুখী কৃষি সমবায় প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এসব সমবায় তাদের কৃষি জীবনে নতুন মাত্রা নিয়ে আসে। কৃষিকাজে বিশেষ সফলতা অর্জনকারীদের কৃষকদের জনসম্মুখে প্রশংসিত করার মাধ্যমে তাদের সম্মান বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা উচিত। তরুণনারী কৃষকদের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দেয়া উচিত, কেননা সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও প্রচলিত সমাজব্যবস্থার কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গ্রামীণ জনপদে তারা উপেক্ষিত ও অবহেলিত থাকে।

৩. নিজেদেরকে সংগঠিত করা, পরস্পরের সাথে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করা এবং নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে ভূমিকার রাখার জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তরুণকৃষকদের সুযোগ দেয়া উচিত। তাদের জন্য নানা নীতি ও প্রকল্প গ্রহণের সময় তরুণকৃষকদের অংশীদারিত্ব থাকাটা খুবই জর"রী। তরুণকৃষকদের সাথে দেশে ও দেশের বাইরে মতবিনিময় সভা আয়োজন করা উচিত। তরুণদেরজন্য তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

৪. গ্রামাঞ্চলে অবকাঠামো এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন করা প্রয়োজন। একইসাথে তরুণকৃষকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ও তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা দরকার।

৫. এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের কৃষকরা মূলত পরিবারভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থার অন্ড়র্ভুক্ত এবং তারা পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত জনগোষ্ঠীর অন্ড়র্ভূত। কৃষি ব্যবস্থার সংস্কার এবং গ্রামীণ জনপদের উন্নয়নের লক্ষ্যে দীর্ঘস্থায়ী বিশেষায়িত নীতি ও প্রকল্প গ্রহণ করার মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে কৃষি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের চিন্ড়া চেতনার পরিবর্তন করা সম্ভব।

তরুণদেরমধ্যে কৃষির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে এ.এফ.এ কী কী পদক্ষেপ নিতে পারে?

১. নীতি নির্ধারণী সহায়তা প্রদানঃ এশিয়ার বেশিরভাগ কৃষকই কৃষি সম্পর্কিত নানা নিয়মকানুন ও প্রকল্প বিষয়ে চিন্ড়িত থাকেন। এ.এফ.এ আঞ্চলিক পর্যায়ে কৃষিখাতে নয়া-উদারনৈতিক নীতি গ্রহণ, কৃষিতে ডব্লিউ.টি.ও প্রণয়ন করা, জলবায়ু পরিবর্তন, মুক্ত বাণিজ্য, ভূমি দখল, তরুণও নারী কৃষকদের অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি নানা বিষয়কে তুলে ধরতে পারে। কৃষক-বান্ধব নীতি ও প্রকল্প গ্রহণ এবং তাদেরকে পর্যাপ্ত সহায়তা প্রদানের জন্য এ.এফ.এ আঞ্চলিক কৃষক এসোসিয়েশনগুলো জাতিসংঘ সংস্থাসমূহের সাথে আলোচনা করতে পারে।

২. এফ. ও বা কৃষক সংগঠনসমূহের জোট গঠনঃ ভূমি এবং কৃষি সম্পর্কিত বিষয়গুলো মূলত রাজনীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই রাজনৈতিক উপায়েই এসব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। তাই, সরকারকে জাতীয় ও আন্ড়র্জাতিক পর্যায়ে এসব সমস্যা

মোকাবিলায় আগ্রহী করার জন্য সামাজিক পর্যায়ে জনমত গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এফ.ও বা কৃষক সংগঠন এবং সি.এস.ও সমূহের মধ্যে জোট গঠনের উদ্যোগ নিতে পারে এ.এফ.এ।

৩. তরুণকৃষক বিনিময় প্রকল্পঃ এ.এফ.এ সদস্যবৃন্দ এবং অন্যান্য কৃষক সংগঠনসমূহ যৌথভাবে স্থিতিশীল আদর্শ কৃষি ব্যবস্থা তৈরি করেছে। এ.এফ.এ চাইলে তরুণকৃষক বিনিময় প্রকল্প চালুর উদ্যোগ নিতে পারে। এছাড়া, কৃষি খামার ব্যবস্থা ও প্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞান বিনিময় করা, নতুন নীতি গ্রহণ করা এবং তরুণদেরকৃষির প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

৪. কৃষক সংগঠনসমূহের মধ্যে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধিঃ যথাযথ আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা ছাড়া স্থিতিশীল পরিবারভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা তৈরি এবং তরুণদেরকৃষির প্রতি আকৃষ্ট করা সম্ভব না। তাই, কৃষি খাতে কর্মরত স্থিতিশীল কৃষক সংগঠন এবং সি.এস.ও সমূহের সাথে বিভিন্ন অঞ্চল ও দেশে কৃষিকে প্রণোদনা দানকারী দাতাদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে পারে এ.এফ.এ।

৫. গবেষণা ও প্রকাশনাঃ পরিবারভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা এবং কৃষিতে তরুণদেরপ্রয়োজনীয়তা বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা এবং নানা প্রকাশনা বের করা খুবই গুর"ত্বপূর্ণ কাজ। এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে পর্যাপ্ত গবেষণা এবং সরকার ও দাতা সংস্থার সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন। এ.এফ.এ যথাযথ গবেষণা করার পাশাপাশি আঞ্চলিক পর্যায়ে সরাসরি আলোচনা আয়োজন করা এবং জাতীয় পর্যায়ে এসব বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করার উদ্যোগ নিতে পারে।

উপসংহার

বিশ্বের মোট তরুণ

জনগোষ্ঠীর শতকরা ৬০ ভাগের মতো বা ৭৫ কোটি এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে বসবাস করে। তাদের মধ্যে ৭০ শতাংশই বসবাস করে গ্রামাঞ্চলে, এবং তাদের অর্ধেকেরও বেশি সরাসরি কৃষিকাজের সাথে যুক্ত। তবে, অনেক গ্রামীণ তরুণই শহরে অথবা বিদেশে চলে যাওয়ার বিষয়ে আগ্রহী। যারা গ্রামে থেকে যান, তাদেরও অনেকেই যথেষ্ট সুযোগ পায় না। তরুণরা লক্ষ্য করে যে, কৃষিকাজ করে পর্যাপ্ত করা সম্ভব না, এটি একটি নিম্নমানের কিন্তু উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন কাজ এবং সরকার ও অন্যান্য সংস্থাগুলোও কৃষির প্রতি ততোটা সহায়ক ভূমিকা পালন করে না।

তবে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করার মাধ্যমে তরুণদেরকৃষির প্রতি আকৃষ্ট করা যেতে পারে- (১) কৃষি থেকে তারা পর্যাপ্ত আয় করতে সক্ষম হবে, (২) তাদেরকে জমি, মূলধন, প্রশিক্ষণ, কৃষি যন্ত্রপাতি এবং কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের বাজারের মতো প্রাথমিক বিষয়গুলো সরবরাহ করা, (৩) তারা যেন তাদের কাজের গুর"ত্ব এবং অর্থ খুঁজে পায়।

তরুণদেরকর্মশক্তি ও সম্ভাবনাকে কৃষির জন্য কাজে লাগানোর জন্য বিশেষায়িত নীতি প্রণয়ন ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া, কৃষি ব্যবস্থার সংস্কার করা, গ্রামীণ জনপদের উন্নয়ন করা, স্থিতিশীল কৃষি পণ্য উৎপাদন এবং কৃষকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা এবং কৃষিপণ্যের জন্য কার্যকর বাজার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা জর"রী। এসব কাজের ক্ষেত্রে তরুণকৃষক, বিশেষ করে নারীদের প্রতি সুবিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

তরুণরাই জাতির ভবিষ্যত, আর গ্রামীণ তরুণরা হলো কৃষি ও গ্রামীণ শিল্পের ভবিষ্যত। যদি আমরা ভবিষ্যতে কৃষক ও খাদ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখতে চাই, তাহলে এখনই কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।